অন্তরে পাপ

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

PDF by Masud Rana wiki team
https://masudrana.fandom.com

সন্ধে সাড়ে ছয়টা। সারাটা দিন কাজ ছিল না। অনেকদিন পর বস্ এসেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসে, এজেন্সির রিপোর্ট চেক করছেন পেছনের কামরায় বসে। রিসেপশনে খামোকা মাছি না মেরে টেবিলের ওপর পা তুলে সান্ধ্য-দৈনিকটা একনজর দেখবে বলে হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল গিলটি মিয়া। দরজার ফ্রন্টেড গ্লাসের ওপাশে এসে দাড়িয়েছে কেউ। চট করে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল ও।

একটা মেয়ে। অল্পবয়েসি। ইতস্তত করছে ঢুকতে। দরজার নবের দিকে দুবার হাত বাড়িয়েও আবার টেনে নিল। তারপর মনস্থির করে লম্বা একটা দম নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে। এগোতে গিয়ে আবার থামল, দেখছে বড়সড় টেবিলের ওপাশে গদিমোড়া চেয়ারে বসা চার ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা মানুষটাকে। তারপর এগিয়ে এল সামনে।

“আপনি কি মাসুদ রানা?” সুরেলা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, ইংরেজি উচ্চারণে স্প্যানিশ টান।

ভিতরের কামরার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জিভ কাটল গিলটি মিয়া, তারপর একগাল হাসল, “আমাকে বসের মতোন লাগে বুজি? না, দিদি। আমি হচ্চি গিয়ে মিশটার গিলটি মিয়া দ্য গ্রেট! তা ডেঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না।”

টেবিলের ওধারে বসা হাফসাইজ লোকটার গালে চার দিনের না-কামানো দাড়ি আর বড় বড় দুই চোখের নিস্পাপ দৃষ্টি দেখে হতাশ হয়েছে মেয়েটি। ঘুরে দাঁড়াতে গেল, আর তাই দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠল গিলটি মিয়া, “আরে, আরে! চললেন কোতায়? আমাকে পচোন্দ হলো না বুজি? বিশ্বাস করুন, আমিই এ বেরাঞ্চের ইন-চাজ।”

এগিয়ে এসে বসল মেয়েটি। না, দেখতে ছোটখাট হলেও, ঠিক কচি খুকি বলা যাবে না একে। নরম সোয়েটার ও টাইট প্যান্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে আস্ত এক নারী।

“আমি মিস্টার মাসুদ রানাকে খুঁজছি। উনি নেই?”

“আচেন। কিন্তু ব্যস্ত। আপনার সমস্যার কতা আমাকে বলতে পারেন,” কাগজ কলম নিল সে, “হ্যা, প্রথম... পরিচয়টা।”

কয়েক সেকেণ্ড গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে থেকে মেয়েটি বলল, “আমার নাম নিনা স্যাণ্ডার্স। আমার হাসব্যান্ড এডি স্যাণ্ডার্স এই দালানেরই চারতলার একটা অফিসে কাজ করে।"

“চিনি,” বলল গিলটি মিয়া, “ওই বিকট... মানে, বিশাল দৈত্যর মতোন লাশটা তো? তা, বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?”

“যা বলব, সেসব আমার স্বামীর কানে যাবে না তো?”

“আপনি না চাইলে যাবে না।” মেয়েটিকে আশ্বস্ত করতে মিষ্টি করে হাসল সে, “ধরে নিন, সিন্দুকে আঁটকানো থাকবে আপনার সব কতা। নিচ্চিন্তে বলতে পারেন।” ওর ইংরেজি-বাংলা-হিন্দি মেশানো উদ্ভট ভাষা পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মানুষের বুঝতে অসুবিধে হয় না। মেয়েটিও বুঝতে পারল সব।

“বেশি পয়সা কিন্তু দিতে পারব না,” বলল মেয়েটি।

“বেশি দিতে হবে নাকো, দিদি। আমরা হারানো পরিদের (লস অ্যাঞ্জেলেস) দেশে এয়েচি মানুষের উবগার করতে। বলে ফেলুন। এট্টু পরেই কিন্তুক বন্দো হয়ে যাবে আপিস। আপনার পব্লেমটা কী, বলুন তো?”

“সমস্যা আমার ভাই পাবলোর। ও আসলে...” নিচের ঠোটের কোনা কামড়ে ধরে এই বেঁটে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কি না ভেবে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হড়বড় করে বলে ফেলল, “অবৈধভাবে চলে এসেছে ও আমেরিকায়।”

চুপচাপ শুনল গিলটি মিয়া, তারপর বলল, “এ আর এমন কী অপরাদ হলো, বলুন? এ টাউনের আদ্দেকই তো... মানে, এখেনে রাস্তায় ডেঁড়িয়ে যে-কোনও দিকে আন্তাজে একটা ঢিল মারলেও দেকা যাবে কোনও না কোনও ইল্লিগাল মেক্সিকানের মাতায় গিয়ে পড়েছে। ঠিক কতা কি না?”

গিলটি মিয়ার প্রাঞ্জল বর্ণনা শুনে মুচকি হাসল পিছনের কামরায় বসা রানা। রিসেপশনের সব কথা শুনতে পাচ্ছে সে গোপন স্পিকারের মাধ্যমে।

মেয়েটির কণ্ঠ ভেসে এল, “আমার হাসব্যাণ্ড আর আমি আমাদের অনেক কষ্টের রোজগার থেকে সাত শ’ ডলার খরচ করে বর্ডার পার করিয়ে ওকে নিয়ে এসেছি আমেরিকায়। এখানে কাজ করে যখন পারবে শোধ করে দেবে ও আমাদের টাকা। ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গেছে, শিগ্গিরই গ্রিনকার্ডও পেয়ে যাবে।”

“ব্যস, তাইলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা। সমস্যা কোতায়?”

“নেকড়েগুলো।”

“আঁ! নেকড়ে বাগ?”

“হ্যাঁ। অবৈধ মেক্সিকানদের টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। আমার ভাইয়ের মত মানুষদের মনে রয়েছে ভয় আর অনিশ্চয়তা। নিরাপত্তার অভাবে ভোগে সবসময়। মেক্সিকোয় ফেরত যাবার চিন্তায় কুঁকড়ে থাকে সারাক্ষণ। তারই সুযোগ নেয় ওরা। বন্ধুর বেশে আসে, সবরকম সাহায্য-

সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর ওদের রোজগারে ভাগ বসায়। কিন্তু কোনও সাহায্য করে না। কেউ নালিশ করলে পেছনে লেলিয়ে দেয় মাইগ্রা... মানে, মাইগ্রেশনের লোকদের।”

“আপনার ভাই ওই নেকড়েদের পাল্লায় পড়েচে, আপনি ঠিক জানেন?”

“জানি না মানে?” হিসিয়ে উঠল মেয়েটা। ল্যাটিন মেজাজ বেরিয়ে আসতে চাইছে। “বুদ্ধুটা আমাকেও কিছু বলতে চায় না। আমি জানি ওর বেতনের অর্ধেকই কেড়ে নিচ্ছে তারা। ও বলে, পুরুষ মানুষের সমস্যার সমাধান তার নিজেরই করা উচিত, মেয়েমানুষের সাহায্য ছাড়াই।”

“কতাটা কি মিত্যে? ঠিক বলেই তো মনে হচ্ছে।”

“যাই হোক, আমি জানি, মস্ত গোলমালে গালে পড়েছে ও। এই ব্যাপারে কি আমি আপনাদের সাহায্য আশা করতে পারি?”

“হয়তো,” বলল গিলটি মিয়া। “কিন্তক তার আগে বলুন দেকি, এসব কতা আপনার স্বামীর কাচে চেপে যেতে চাইছেন কেন?”

“এডি অনেক করেছে আমার ভাইয়ের জন্যে। আরও বেশি কিছু চাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।” সরাসরি গিলটি মিয়ার চোখে চোখ রাখল নিনা। আমার নিজের উপার্জনের টাকায় পেমেন্ট করব আমি... যদিও জানি না, এ টাকা যথেষ্ট হবে কি না। যদি এই টাকায় কুলায় তা হলে আমি আপনাদের সাহায্য চাইব।”

“কত আছে আপনার কাচে?”

ব্যাগ ঘেঁটে ছোটবড় কয়েকটা নোট বের করল মেয়েটা, টেবিলের ওপর বিছিয়ে ভাঁজগুলো ডলে সমান করল, তারপর বাড়িয়ে দিল গিলটি মিয়ার দিকে, “বিশ ডলার। এতে হবে?”

নিস্পাপ দৃষ্টিতে ওকে দেখল গিলটি মিয়া। রানা এজেন্সির প্রাথমিক ফি-ই পাঁচ শ’ ডলার। কিন্তু ভাইয়ের মঙ্গলচিন্তায় উদ্বিগ্ন বোনকে সে কথা জানাতে ইচ্ছে করল না ওর। মৃদু হেসে নোটগুলো কাছে টেনে নিল। গুনে দেখে খুচরো দশটা ডলার ঠেলে দিল মেয়েটির দিকে। “এত লাগবেনি, দিদি। দশ ডলারই যতেষ্ঠ।”

আবারো মুচকি হেসে সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা।|

“তবে,” আবার বলল গিলটি মিয়া, “কাজ শুরুর আগে আমি আপনার ভাই পাবলোর সাতে দুটো কতা বলব। ইংরিজি বোজে তো?”

“কিছু কিছু। দোভাষী হিসেবে আমি সাথে থাকব আপনার। কাল সকালে কি আপনার সুবিধে হবে?” ছোট নোটগুলো পার্স-এ রেখে দিল মেয়েটি।

“নিশ্চয়। সকাল সাড়ে দশটায়। ঠিকাচে?”

“হ্যাঁ... আমি ঠিক সাড়ে দশটায় পৌছে যাব এখানে,” বলে উঠে দাঁড়াল নিনা।

গিলটি মিয়ার মনে হলো কী যেন গোপন করে যাচ্ছে মেয়েটি, কিন্তু জিজ্ঞাসার সুযোগ হলো না। কাঁচের দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল মুশকো চেহারার এক লোক। গিলটি মিয়ার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে “হাই!” বলে ফিরল নিনার দিকে।

“নিনা, তুমি কী করো এখানে? যেতে যেতে মনে হলো তোমার গলা শুনলাম।”

অম্লানবদনে মিথ্যে বলল নিনা, “ওহ্, এডি! তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম এই ভদ্রলোককে। তুমি বেরিয়ে না গিয়ে থাকলে একসঙ্গে ঘরে ফিরব, তাই। তুমি কি নামছ?”

“না, উঠছি। কফি খেতে গিয়েছিলাম। তোমাকে না বলেছি, ফিরতে আজ দেরি হবে আমার?”

“কী জানি... মনে নেই,” বলল নিনা। “তোমার জন্যে অপেক্ষা করি তা হলে?”

“না। তিনঘণ্টা খামোকা বসে থাকবে কী করতে। বাসায় চলে যাও। অনেক কাজ ঘাড়ে চেপেছে আজ, ফিরতে রাত এগারোটা হবে।”

“ঠিক আছে, এডি।”

এতক্ষণ মুখ তুলে আসমানের দিকে চেয়ে কথা বলছিল নিনা, এবার চোখ নামাল। দুজনে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

“কী বুজলেন, সার? শুনেচেন তো সব। মিথ্যুক না?”

“পাক্কা!” গম্ভীর সুরে বলল রানা।

“তা হলে কি কাজটা নেয়া ভুল হলো?”

“না, ভুল হয়নি। আর দশ ডলার ফি নিলে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার তুমি বাসায় চলে যাও। আমি অফিস বন্ধ করে ফিরব ঘণ্টাখানেক পর।”

পরদিন ঠিক সাড়ে দশটায় পৌছুল মেয়েটি। রানার সঙ্গে নিনার পরিচয় করিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

হঠাৎ “আমিও যাব,” বলে উঠে দাঁড়াল রানা।

একটু অবাক হলেও খুশি হলো গিলটি মিয়া। সারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ রোজ মেলে না।

সাত দিনের জন্যে ‘রেন্ট-আ-কার’ কোম্পানি থেকে একটা টয়োটা প্রিমিও ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এতেই চাপল তিনজন। রানা ড্রাইভ করছে, প্যাসেঞ্জার সিটে বসল নিনা, আর পেছনের সিটে গিলটি মিয়া।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুব অঞ্চলের দিকে চলেছে গাড়ি। রাস্তা দেখাচ্ছে, আর হালকা মেজাজে অনেক কথা বলছে নিনা। ওর ছোট্ট কেসটাকে রানা এতটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে নিজেই চলে এসেছে বলে দারুণ খুশি। কথায় কথায় বলে ফেলল, বছরখানেক আগে ও নিজেও অবৈধভাবে বর্ডার ক্রস করে ঢুকেছে এদেশে, প্রথম সুযোগেই আমেরিকান সিটিজেন এডি স্যাণ্ডার্সকে বিয়ে করে বৈধ করে নিয়েছে নিজের নাগরিকত্ব। এখন চেষ্টা করছে, ওর ভাইও যেন এদেশের নাগরিক হিসেবে বৈধতা পায়।

নোংরা, ঘিঞ্জি এলাকায় থাকে পাবলো। রাস্তার দুপাশের ড্রেন নানান রকম আবর্জনার গন্ধ ছড়াচ্ছে। নিনার সঙ্গে দুজন বিদেশিকে ঝকঝকে, দামি গাড়ি থেকে নামতে দেখেও না দেখার ভান করছে এলাকার লোকজন। একটা পনশপ আর ছোট্ট একটা কফি বারের ওপর তলার কামরা ভাড়া নিয়েছে নিনার ভাই। রাস্তার ওপাশের শুড়িখানা থেকে ভেসে আসছে কান ফাটানো সঙ্গীত।

নিনার পিছু পিছু মইয়ের মত সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা। দরজায় ট্যাকপিন দিয়ে আটকানো একটা সাদা কার্ডে বলপেন দিয়ে লেখা জি. এস. পাবলো।

আস্তে করে টোকা দিল নিনা, একটু থেমে আবার।

“বোধহয় ঘুমিয়ে আছে পাবলো,” বলল ও। “নাইট শিফটে কাজ করে তো।”

আরও জোরে টোকা, তারপর নাম ধরে ডাক দিল নিনা; তবু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ভুরু কুঁচকে গেল মেয়েটির, ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেছে।

হাত বাড়িয়ে দরজার নব ধরে মোচড় দিল রানা। তালা নেই, ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। নিনার পিছু নিয়ে ঘরে ঢুকল রানা ও গিলটি মিয়া। বাসি কাপড়, ঘাম, তেলাপোকা ও ইঁদুরের বোটকা গন্ধে এক ছুটে রাস্তায় চলে যেতে ইচ্ছে করল গিলটি মিয়ার।

ঘরে ঢুকলে প্রথমেই নজর কাড়ে দেয়ালে টাঙানো এক নগ্নবক্ষা যুবতীর রঙীন পোস্টার। কাঠের নড়বড়ে টেবিল আর পায়া মচকানো চেয়ার পাশ কাটিয়ে প্রায় উড়ে চলে গেল নিনা ওপাশে রাখা

নিচু চৌকির কাছে। বেকায়দা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সুদর্শন এক যুবক- রক্তে ভিজে গেছে শার্ট। একনজর দেখেই টের পেল রানা, মারা গেছে পাবলো। এলোপাতাড়ি ছুরি মারা হয়েছে ওর বুকে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে নিনা। কান্নায় ভেঙে পড়ার আগে ফিসফিস করে বলল, 'মাদ্রে দিয়োস' সামনে এগোতে যাচ্ছিল, ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

সামনে ঝুকে লাশের বুকের আঘাতগুলো পরীক্ষা করল রানা কয়েক সেকেণ্ড, তারপর একটি কথা না বলে মেয়েটিকে নিয়ে নেমে গেল নিচে। এখন আর ফোঁপাচ্ছে না, কিন্তু দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে নিনার, গালে চক চক করছে পানির দাগ। সান্তনা দেবার চেষ্টা করল না রানা। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে যোগাযোগ করল থানায়। তারপর তিন মগ কফির অর্ডার দিয়ে বসল কাফেতে। নিনা একটু শান্ত হয়ে আসতে বলল রানা, "আপনাদের বাসার ফোন নাম্বারটা বলুন।"

গড়গড় করে নাম্বার বলল নিনা।

"স্যাণ্ডার্স?" ল্যাণ্ডফোন রিসিভার তোলার শব্দ শুনেই বলল রানা।

"হা। আপনি কে?" ভারী গলায় হুঙ্কার ছাড়ল নিনার স্বামী।

"মাসুদ রানা। গতকাল সন্ধ্যায় একবার আমার অফিসে এসেছিলেন আপনি। আমি আপনার শ্যালক পাবলোর ওখান থেকে বলছি। আপনার স্ত্রী আছেন আমাদের সঙ্গে। আপনি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

"কেন? কী হয়েছে?"
"পাবলো মারা গেছে।"

"আঁ!" কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। "আসছি আমি।" খটাং করে ক্রেডলে নামিয়ে রাখল স্যাণ্ডার্স ল্যান্ডফোনের রিসিভার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে গেল পুলিশ। চারপাশে ভিড় জমতে শুরু করেছে। শীতল

দৃষ্টিতে দেখছে ওরা পুলিশকে, বিদ্বেষ গোপন করছে না।

রানাকে দেখে এগিয়ে এল হোমিসাইডের চিফ ক্লিফটন ক্লে। যতটুকু জানে জানাল রানা তাকে। সিঁড়ি বেয়ে দলবল নিয়ে সে দোতলায় উঠে যেতেই আরেক মগ কফির অর্ডার দিল। অল্পক্ষণেই পাবলোর ঘর থেকে নেমে এল পুলিশ, প্রতিবেশীদের জবানবন্দি নিচ্ছে এখন। একটা সিগারেট ধরিয়ে রানার পাশে এসে বসল ক্লিফটন ক্লে।

“কী বুঝলেন?” জিজ্ঞাসা করল রানা।

মেজাজ খাট্টা হয়ে গেছে অফিসারের, মুখটাকে বাংলার ৫ বানিয়ে বলল, “কিছু না। কেউ কিছু শোনেনি, কেউ কিছু দেখেনি, কেউ চেনেই না লোকটাকে। যেটুকু বুঝেছি, কেসটা চুরি-ডাকাতির নয়। ওর কাছে পুরো দশটা ডলার ছিল। এ-অঞ্চলে এটা অনেক টাকা। ওটা ছুঁয়েও দেখেনি খুনি।” গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল অফিসার, “মিস্টার গিলটি, আপনি কি তদন্ত চালিয়ে যেতে চান?”

“আর উপায় কী, বলুন? পয়সা যা লিয়েচি, উসুল হোইনিকো। আমি আচি এর

পেচনে।”

“কিছু জানতে পারলে আমাকে ইনফর্ম করবেন তো?”

“নিচ্চয়।”

স্বামীর গায়ে হেলান দিয়ে দোতলা থেকে নেমে এল নিনা। বেচারির অবস্থা দেখে খারাপই লাগল রানার। মনে মনে স্থির করে ফেলল কোন্ পথে এগোবে। স্যাণ্ডার্সকে জিজ্ঞাসা করল, “কী অবস্থা আপনার ওয়াইফের?”

“ভয়ানক শক্ পেয়েছে। আপন ভাই বলে কথা। বেচারা পাবলো। আমার সঙ্গে সাত-আট দিন আগে শেষ দেখা। কী খুশি চাকরি পেয়ে! একটা চাকরি পাওয়া মানে তো অল্পদিনেই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়ে যাওয়া।”

“কোথায় চাকরি পেয়েছিল?”

“একটা ফার্নিচার কোম্পানিতে। ফ্রেণ্ডস ফার্নিচার। এই তো এখান থেকে দু-তিন ব্লক পরেই।”

“আপনার স্ত্রীর দিকে একটু বাড়তি খেয়াল দেবেন,” পরামর্শ দিল রানা। “বেচারি ভেঙে পড়েছে একেবারে।”

“তা তো বটেই।” একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখাল স্যাণ্ডার্স।

“আমরাও যোগাযোগ রাখব,” বলে প্রিমিওর দিকে এগোল রানা গিলটি মিয়াকে

নিয়ে।

অফিসে ফেরার পথে গজ পঞ্চাশেক গিয়েই ব্রেক চাপল রানা।

“গিলটি মিয়া, তুমি ওই ফার্নিচার কোম্পানিতে একটা টু মেরে তারপর অফিসে

এসো।”

প্যাসিফিক বুলেভার্ডের একটা অটো স্যালভেজ ইয়ার্ডের পাশেই ফ্রেণ্ডস্ ফার্নিচারের শো-রুম। জানালার গায়ে চটকদার বিজ্ঞাপনের নিচে লেখা: এত কম দামে এত ভাল ফার্নিচার পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। সুড়ুত করে ঢুকে পড়ল গিলটি মিয়া। স্পিরিটের তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে পালিশ করা ফার্নিচার। দুপাশে সাজিয়ে রাখা সোফা, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, খাট, আলমিরা, ওয়ারড্রোব ইত্যাদি- মাঝখান দিয়ে ভেতরের কারখানায় আসা-যাওয়ার সরু গলি। বাঁ পায়ে সামান্য খুঁড়িয়ে সামনে এগোল গিলটি মিয়া।

ডজন দেড়েক নারী-পুরুষ করাত, রাদা, হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত। জনা কয়েক আইকা-গ্লু দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে কাঠ, আরেক দল গদি আঁটছে সোফায়। কাজের তদারকিতে রয়েছে সরু, লম্বা এক টাক-মাথা লোক, নাকটা বাজপাখির ঠোটের মত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বাঁকা, নাকের দুপাশে কাছাকাছি বসানো ছোট ছোট চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। তার সামনে নয়-ছয় চলবে না কারও, *খেজি মেরে* চমকে দেবে পিলে।

এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল গিলটি মিয়া। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলাল লোকটা। একনজর দেখেই বুঝল কিছু কিনবে না এ লোক। নিজের কোমরসমান লম্বা, শুকনো, সিকি ইঞ্চি খোঁচা-খোচা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা কালো লোকটাকে পছন্দ না হলেও সেটা প্রকাশ করল না সে। নিজের নাম বলল, "জি. হেণ্ডারসন।" জানাল: এই প্রতিষ্ঠানের সে-ই মালিক। এবং ব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই।

"চলুন, আপনার আপিসে গিয়ে বসা যাক," যেন লোকটার কথা শুনতেই পায়নি,

এমনিভাবে বলল গিলটি মিয়া। অফিসের দিকে পা বাড়াল সে।

"দাঁড়ান!" ভুরু কুঁচকে ফেলেছে বাজপাখি। "বলেছি না, আমার সময় নেই?"

"খুনের তদন্ত কত্তে এয়েচি, বাওয়া। চোটপাট দেকাবেন না, আমি রানা এজেন্সির গোয়েন্দা আচি।"

মুহূর্তে কেচো হয়ে গেল হেণ্ডারসন।

"গোয়েন্দা! কে খুন হলো, কোথায়? আসুন আমার সাথে।"

"এই তো লাইনে এয়েচো, বাওয়া," মনে মনে কথাটা বলে লম্বুর সঙ্গে তার অফিসে গিয়ে ঢুকল। একটা চেয়ারে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "জি. এস. পাবলো কাজ করত আপনার ফ্যাক্টরিতে?"

"করত," জোর দিয়ে বলল লম্বু, "এখন আর করে না। করবেও না। কাল রাত থেকে ডুব মেরেছে। ওকে আর আমি..."

“আর ও আসবে না,” বলল গিলটি মিয়া। “খুন হয়ে গেচে ছোকরা কাল রেতে। সেই তদন্তেই তো এয়েচি।”

ছোট ছোট চোখ যতটা সম্ভব বড় করার চেষ্টা করল হেণ্ডারসন। চেহারায় দুঃখের ভাব।

“পাবলো খুন হয়েছে? দুদিন না যেতেই জড়িয়ে পড়ল ঝগড়া-ফ্যাসাদে! কোথায়, কীভাবে...”

“এখেনে এয়েচিল কবে?” বাধা দিয়ে জানতে চাইল গিলটি মিয়া। “স্বভাব-চরিত্ত কেমন ছিল?”

“মিলেমিশেই তো কাজ করছিল, কাজেও কোনও গাফিলতি ছিল না,” বলল লম্বু বাজপাখি। “এসেছিল দিন চারেক আগে।”

“ও যে অবৈদভাবে বঠার করোস করে এয়েচিল, আপনি নিচ্চয় জানতেন?”

“প্রায় সবাই তো তাই করে,” জবাব দিল কারখানার মালিক। “এদেরকে কাজে নিতে সরকারের তরফ থেকে কোনও বিধিনিষেধ নেই।”

“তা ছাড়া আর কে-ই বা প্রায়-মাগনা বেগার খাটবে। তাই না?”

“কাজ যে পায়, তাই তো কপাল ওদের!” রেগে গেল ফার্নিচার মালিক। “এই খাটুনি করে ওরা মেক্সিকোতে যা পেত, তার চেয়ে বেশিই দিচ্ছি আমি। আমরা কাজ না দিলে ওরা না খেয়ে মরত, কিংবা চুরি-ডাকাতি বা খুন-খারাবি করে জেল খাটত।”

“যা বলেচেন,” সায় দিল গোয়েন্দাপ্রবর।

“তা ছাড়া এদেরকে সাধ্যমত সবরকম সাহায্যই করি আমি। আপনার ওই পাবলোকেও তো তিন দিন আগেই একটা কামরা দেখে দিয়েছি, কারখানার কাছাকাছি। ফলে ওর বাসভাড়া বেঁচে গেল না?”

“ঠিক। বাড়িআলার কাচ থেকেও কিছু কমিশন পাওয়া গেল, মোন্দ কী, ভালই তো।”

“আপনি আসলে ঠিক কী জানতে চাইছেন, মিস্টার গিলটি?”

“আমি জানতে চাই, এইসব কাজের লোক আপনি পান কোতায়?”

“মানে?”

“মানে, পাটায় কে আপনার কাচে? নিচ্চয় নিদ্দিষ্ট কেউ পাটায়। রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুত্তে ঘুত্তে এরা সবাই হটাৎ পেয়ে গেল আপনাকে... সম্বব? না। আমি জানতে চাই পাটায় কে?”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজল হেণ্ডারসন, কিন্তু সেটা না পেয়ে সংক্ষেপে বলল, “গুয়েরা।”

“কে সে?” ভুরুজোড়া কপালে তুলল গিলটি মিয়া।

“জনসন অ্যাণ্ড জনসন কোম্পানির স্যামুয়েল গুয়েরা।”

একটা কার্ড বের করল সে ওয়ালেট হাতড়ে। সেটা গিলটি মিয়ার হাতে দিল। নামের নিচে রয়েছে পরিচয়: ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস, সি হাবলা এসপানল। ঠিকানা: ২৪/৪-এ ব্রুকলিন অ্যাভিনিউ, লস অ্যাঞ্জেলেস।

জায়গাটা কাছেই। লম্বুকে ধন্যবাদ জানিয়ে কার্ডটা পকেটে পুরল গিলটি মিয়া। দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় কানে এল, ল্যাণ্ডফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করছে বাজপাখি।

ব্রুকলিন অ্যাভিনিউয়ের কাছাকাছি পৌছে রাস্তার ধারে একটা কফি শপ দেখে তেষ্টা পেয়ে গেল গিলটি মিয়ার। ফুটপাথ-ঘেঁষা চেয়ারে বসে এক কাপ কফির অর্ডার দিল ও, সঙ্গে দুটো বিস্কিট। দশ মিনিটের মাথায় এল ওরা। অল্পবয়েসী, লম্বাচুলো দুই মস্তান। টাইট প্যান্টগুলো এতই নিচু করে পরা যে, খসে যেতে চাইছে কোমর থেকে। অপেক্ষাকৃত লম্বাজনের গালে ট্রেডমার্ক রয়েছে- চোখের পাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত লম্বা কাটা দাগ। গিলটি মিয়ার টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল ওরা।

“ম্যাচ হবে, মিস্টার?” জিজ্ঞেস করল একজন। ঠোটের কোণে ঝুলছে প্যাকেট থেকে সদ্য বের করা সিগারেট, কথার সঙ্গে ওপর-নিচে লাফাচ্ছে ওটা। বিরক্ত দৃষ্টিতে একে একে দুজনকে দেখল গিলটি মিয়া। তারপর একটু জোরেই বলল, “না, হবে না।”

“হবে না মানে? সিগারেট খাও না তুমি? কচি খোকা?” লিডারকে বলল, “কী বুঝলি, রবার্তো? প্যাদানি ছাড়া সিধে হবে এটা?”

গালকাটা রবার্তো বলল, “এমন ট্যারা জবাব দিচ্ছ যে?” গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল বাঘের চোখে। “হিসপ্যানিকদের পছন্দ হয় না বুঝি তোমার?”

“হয়,” বলল গিলটি মিয়া, “কিন্তু তোমাদের ইতরামি আমার পচোন্দ হচ্চে না। যাও তো, ভাগো এখেন থেকে!”

অবাক চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল লিডার। তাজ্জব হয়ে গেছে ঝাটার কাঠির মত

শুকনো, বেঁটে এক লোকের বাতচিত শুনে।

“শুনলি, ভিকো? নেংটি ইঁদুরটা কী বলল, শুনলি? আমাদের এলাকায় এসে আমাদেরকেই বলছে ভাগো! কত বড় সাহস!! আয়, এটাকে তুলে নিয়ে যাই রাস্তায়। সবার সামনে আচ্ছা মতন ধোলাই দেবার পর একটা কান কেটে ধরিয়ে দেব ব্যাটার হাতে।”

ঝট করে ভয়ালদর্শন ছোরাটা বের করল ছোকরা। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল পাড়া ফাটিয়ে।

ছলাৎ করে এক মগ ফুটন্ত কফি গিয়ে পড়েছে ওর চোখেমুখে। শুয়ে পড়ল সে দোকানের মেঝেতে, লাফাচ্ছে হাফ-জবাই মুরগির মত। দ্বিতীয়জন মুঠি পাকিয়ে এগোতে যাচ্ছিল, কফির মগটা ছুটে আসছে দেখে কুঁজো হয়ে দুই হাতে মাথা ঢাকল সে। সাই করে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল মগ। ছোকরা হাত যখন সরাল তখন সামনের চেয়ার ফাকা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে পাই পাই ছুটছে তাদের শিকার। ওস্তাদের ছোরাটা মেঝে থেকে তুলেই পিছু নিল ভিকো। গিলটি মিয়ার চেয়ে দ্বিগুণ জোরে ছুটতে পারে সতেরো বছরের তরুণ, ধরে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগল না।

পিছন থেকে খপ্ করে কলার চেপে ধরে হ্যাচকা টানে নিজের দিকে ফেরাল সে গিলটি মিয়াকে।

“এইবার?” হাঁপাচ্ছে বেদম। “এইবার দেখাচ্ছি তোকে মজা!”

“ছেড়ে দে, বলচি!” মুখে বলল বটে, কিন্তু বুঝে গেছে গিলটি মিয়া, কপালে খারাবি আছে আজ।

ফালতু কথায় গেল না রংবাজ। চট করে কাজ সেরে কেটে পড়তে হবে এখান থেকে। থাবা দিয়ে ধরল গিলটি মিয়ার চুল। ঠিক যখন ছোরাটা ওর পেটে ঢোকাতে যাচ্ছে, পেছন থেকে কে যেন গোক্ষুরের মত ছোবল মারল ওর কব্জিতে।

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করল ভিকো, কিন্তু বজ্রমুষ্টি ঢিল হলো না একটুও। ও জানে না: এর নাম মাসুদ রানা।

কব্জিটা ধরেই মুচড়ে নিয়ে গেছে ওর পিঠের ওপর। বামহাতে খামচি দেয়ার চেষ্টা করল ভিকো রানার চোখে। বিন্দুমাত্র দয়া না দেখিয়ে মড়াৎ করে ভেঙে দিল রানা ওর কাঁধের হাড়।

“বাবারে!” বলে চিৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠল ছোকরা, মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ল। তার আগেই জোরালো এক লাথি এসে পড়েছে তার পাঁজরে, টাস্ শব্দ তুলে ভেঙেছে পাঁজরের একটা হাড়। জ্ঞান হারিয়েছে মস্তান। ফাঁকা হয়ে গেছে রাস্তা।

“আরাকটু হলেই গেচিলুম!” বলল গিলটি মিয়া। “বড় জব্বর মার মেরেচেন, সার! ঠিক অ্যাকাবারে ক্যালকাটার সেই লালবাজার থানার ভূপেন দারোগার মতোন।”

রাস্তা থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে গিলটি মিয়াকে ইশারা করল রানা, “চলো, গাড়িতে উঠে শুনব সব।”

খড়মড় আওয়াজ তুলে কফি শপের শাটার নামল। এই এলাকার কেউ কিছুই জানে না, কিছু দেখেনি, শোনেও নি।

জনসন অ্যাণ্ড জনসন ইমিগ্রেশন সার্ভিসের দরজার সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে থামল রানার প্রিমিও।

ওয়েটিং রুমে বেশ কয়েকজন সন্ত্রস্ত মেক্সিকান বসে আছে ভেতর থেকে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায়। কামরার শেষ মাথায় একটা দরজার পাশে ছোট্ট টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে একজন রং মাখা মহিলা। সোজা তার সামনে গিয়ে থামল রানা। ওর পেছনে গিলটি মিয়া।

"গুয়েরা কোথায়?"

রানাকে একনজর দেখে নিয়ে পাশের বন্ধ দরজার দিকে চাইল মহিলা। বলল, "খুব ব্যস্ত। ক্লায়েন্টের সঙ্গে আলাপ করছেন। আপনার কী দরকার বলুন, আমি ওঁকে খবর দিচ্ছি। কী নাম যেন আপনার, স্যর?"

"আপনার কষ্ট করতে হবে না," বলল রানা। পাশের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। রানা, সঙ্গে গিলটি মিয়া।

কোনও ক্লায়েন্ট নেই। থলথলে মোটা শরীর, ঘন কালো ভ্রু ও পুরু গোঁফ বাগিয়ে বসে আছে এক লোক মস্ত এক টেবিলের ওপাশে। চমকে উঠল। এভাবে কামরায় ঢুকে পড়ায় রেগে উঠবে কি না বুঝে ওঠার আগেই চমকে উঠল আবার। কঠোর চেহারার লোকটা খটাস্ শব্দে ছোরাটা রেখেছে টেবিলের ওপর।

"আপনার স্যাঙাত রবার্তোর ছোরা এটা। পড়ে ছিল রাস্তায়।"

ভুরুজোড়া কপালে তুলল গুয়েরা, "কী হয়েছে।"

"ওরা দুজনই পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে। রবার্তোর চোখমুখ ঝলসে গেছে গরম কফিতে, আর ভিকোটা কাঁধের হাড় ভেঙে এখনও রাস্তায় শুয়ে গোঙাচ্ছে। পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে।"

"এসবের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই," কিছুটা সামলে নিয়ে বলল গুয়েরা। "কী চান আপনারা, আমার কাছে এসেছেন কী কারণে? আমি তো কোনও আইন ভঙ্গ করিনি।"

"দুই গুণ্ডা পাঠিয়ে আমাদের শায়েস্তা করতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই কোনও বেআইনী কাজের মধ্যে পড়ে না, তাই না? যাই হোক, গুয়েরা, তোমার কাজটা আমার পছন্দ হয়নি। এবার তোমার কাছ থেকে আমি সরাসরি কিছু প্রশ্নের জবাব চাই।"

“কারও কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই, মিস্টার। তোমাদেরও কোনও অধিকার নেই আমার অফিসে জোর করে ঢুকে আমাকে হুমকি দেওয়ার।”

কথা বলতে বলতে অলক্ষে ডানহাতটা নিয়ে যাচ্ছে গুয়েরা ডেস্কের ড্রয়ারের দিকে। সবে চারটে আঙুল ঢুকিয়েছে, যেন লক্ষই করেনি এমনি ভঙ্গিতে সামনে সামান্য ঝুঁকল রানা, তারপর বিদ্যুদ্বেগে হাত বাড়িয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল ড্রয়ারটা। আঙুলগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যেতেই “আঁউ” করে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছাড়ল মোটকু, হাত টেনে নিয়ে মুখে পুরল আঙুল। ওদিকে টেবিল ঘুরে ড্রয়ারের পাশে পৌঁছে গেছে গিলটি মিয়া, আলগোছে ড্রয়ার থেকে একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তল তুলে নিল সে।

“জি. এস. পাবলো সম্পর্কে কিছু বলো, শুনি,” বলল রানা।

ব্যথা ও ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে গুয়েরার দুই চোখে। কোনও মতে বলল, “ওই নামের কাউকে আমি চিনি না।”

দেখো, স্যামুয়েল গুয়েরা, তোমার একটা হাত গেছে, ত্যাড়ামি করলে কিন্তু অন্যটাও যাবে। তখন আমাকে দোষ দিতে পারবে না।”

রানার কথায় নয়, হুমকিতেও নয়- গুয়েরার মত পোড় খাওয়া ঘুঘু মচকাল আসলে রানার হাসি হাসি চেহারা দেখে। পাঁচ সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, “কী জানতে চাও ওর ব্যাপারে?”

“গত রাতে কে ছুরি মারল পাবলোকে?”

অবাক হবার ভঙ্গি করল গুয়েরা, তারপর বলল, “এ ব্যাপারে কিছু জানি না আমি তোমার জানা থাকলে আমাকে বলতে পার। মারা গেছে?”

“গেছে।”

“ইশ্! ছেলেটাকে আমার পছন্দই হয়েছিল। ওকে খুন করার ইচ্ছে আমার হয়নি, কখনও হবেও না। তুমি হয়তো জানো না, আমিই ওকে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলাম। তাছাড়া জোর তদবির চালিয়েছি ওকে রেসিডেন্ট কার্ড পাইয়ে দিতে।”

“সাহায্যের বিনিময়ে ওর বেতনের কত পার্সেন্ট সাটাচ্ছিলে?”

“দেখো, আমাকেও তো বাঁচতে হবে। নাকি? এদের বৈধতা দিতেও অনেক খরচা হয়। তোমার ওই পাবলোর কোনও কাগজপত্রই ছিল না। তার ওপর যদি আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও কোনও বৈধ নাগরিক না থাকে তা হলে তাকে বৈধতা দান করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। ও যা বলছে তার সপক্ষে হলফ করা নোটারাইজড স্টেটমেন্ট থাকতে হবে। আর বিশ্বাস করো, এখানকার

চিকানোগুলো কোনও রকম কাগজেই সই দিতে চায় না। স্বীকার করছি, পাবলো কার্ডের জন্যে টাকা দিয়েছে আমাকে। এদের জন্যে বাকিতে কাজ করার কোনও মানেই হয় না। কারণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই যে-কোনও সময়ে ধরা পড়তে পারে এরা, আর তা হলেই পরদিন বাসে বোঝাই করে ফেরত পাঠানো হবে মেক্সিকোয়।”

তা হলে একে নিয়ে এপর্যন্ত পাবলোর টাকায় ভাগ বসাচ্ছে এমন দুটো পক্ষের খবর পাওয়া গেল। যদিও এই জানায় পাবলোর কিছুমাত্র লাভ বা লোকসান হবে না। রানা অবশ্য ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছে কে খুন করেছে পাবলোকে, এবং কেন।

গুলি বের করে নিয়ে পিস্তলটা ফেরত দিল রানা গুয়েরাকে। আঙুলে বরফের সেঁক নেবার পরামর্শ দিল ওকে। তারপর গাড়িতে উঠে সোজা গিয়ে হাজির হলো নিনা ও এডি স্যাণ্ডার্সের বাড়িতে। এলাকাটা পুরনো, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিটা বাড়ির সামনে ছোট লনে সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে।

নিনা বেরিয়ে এল বেল টিপ দিতেই। চোখদুটো লাল, গাল ফোলা। জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার?”

“স্যাণ্ডার্স বাসায় আছে?”

“ঘুমাচ্ছে।”

“ডাক দিন। ঘুম থেকে তুলুন।”

একপাশে সরে রানা ও গিলটি মিয়াকে ভেতরে ঢোকার জায়গা দিল নিনা। ওদেরকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বেডরুমে চলে গেল। দুই মিনিটের মধ্যেই এডি স্যাণ্ডার্সকে নিয়ে ফিরে এল সে।

“মিস্টার স্যাণ্ডার্স,” রানা জিজ্ঞাসা করল, “গত একটা সপ্তাহে পাবলোর সঙ্গে আপনার দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি, এই কথা বললেন আজ সকাল বেলা?”

“হ্যা, বলেছি। হয়নি দেখা।”

“তা হলে সকালে যে গেলেন, কী করে জানলেন কোথায় ওর বাসাটা?”

“আপনি ফোনে আমাকে জানিয়েছেন।”

“না, আমি কেবল বলেছি শীঘ্রি চলে আসুন আপনার শ্যালকের বাসায়।”

হাসল রানা। “আপনি আমাকে বলেছেন: সাত দিন আগে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে, চাকরি পেয়ে কী খুশি তাই না? অথচ চাকরি পেয়েছে ও মাত্র তিন দিন আগে। ঘরটা পেয়েছে তারও পরে।”

“কী বলছেন!” এক পা এগিয়ে এল নিনা।

ওর কথা পাত্তা না দিয়ে স্যাণ্ডার্সের দিকেই প্রশ্নবাণ ছুঁড়ল ও আরও একটা। “আর গতকাল রাত দশটা পর্যন্ত আপনি অফিসে কাজ করেননি। আমি আটটায় অফিস থেকে বেরিয়ে আপনার খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সাতটা দশে বেরিয়ে গেছেন আপনি। এবং তারপর খুন করেছেন পাবলোকে।”

“কী আজগুবি কথা বলছেন পাগলের মত!” খেঁকিয়ে উঠল এডি স্যাণ্ডার্স। “আমি কেন আমার স্ত্রীর ভাইকে খুন করতে যাব?”

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে নিনা এর স্বামীর মুখের দিকে। “তার মানে, তার মানে তুমি জানতে! তাই না?”

“হ্যা,” জবাবটা রানাই দিল। “সম্ভবত কথাটা জানতে পেরেছে ও ইমিগ্রেশনের স্যামুয়েল গুয়েরার কাছ থেকে। পাবলোর যে এদেশে কোনও আত্মীয় নেই একথা গুয়েরাকে জানিয়েছে পাবলো নিজে। কেউ নেই ওর- না মা, না বাবা, না ভাই, না বোন।”

হাল ছেড়ে দিল স্যাণ্ডার্স। বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

“ঠিক আছে, মিস্টার রানা। স্বীকার না করে উপায় নেই আমার। কখন জানলাম? যখন গুয়েরা আমাকে একটা কাগজে সই করতে বলল, তখনই বাজ পড়ল আমার মাথায়। ও নিনার ভাই নয়! কল্পনায় দেখতে পেলাম, সবাই হাসছে আমাকে নিয়ে! চিন্তা করুন: যে-লোক এত খরচ-খরচা করে নিজের স্ত্রীর প্রেমিককে নিয়ে এসেছে এই দেশে, তাকে নিয়ে কেন হাসবে না লোকে? সত্যি তো, হাসিরই ব্যাপার!”

“গতকাল সন্ধের পর নিনার পিছু পিছু আমিও অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, ওকে অনুসরণ করে দেখলাম বাসায় না গিয়ে ও সোজা ওর প্রেমিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর রাস্তার ওপাশের বারে বসে বিয়ার টেনেছি একটার পর একটা। দেড়ঘন্টা পর বেরিয়ে এল ও কামরা থেকে, চলে গেল বাসার দিকে।”

“এবার আমি উঠে গেলাম সিড়ি বেয়ে। দেখলাম, কাজে যাবে বলে কাপড় পরছে পাবলো। ছোট্ট ঘরে নিনার পারফিউমের গন্ধ। জিজ্ঞাসা করলাম, নিনা এসেছিল কি না। স্রেফ অস্বীকার করল। যখন বললাম আমি সব দেখেছি, আমার মুখের ওপর হাসল ও।

আর সহ্য করতে পারিনি। তখনই ছুরি মেরেছি আমি ওকে।”

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার।

একটু পরেই পুলিশ এসে নিয়ে গেল স্যাণ্ডার্সকে।

রানা আর গিলটি মিয়াও বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল নিনা, “আমার কী হবে এখন?”

“তোমার মাতায় অনেক কুবুদ্দি আচে গো, দিদি,” বলল গিলটি মিয়া। সহানুভূতির লেশমাত্র নেই ওর কণ্ঠে, “দুজনের সব্বোনাশ করেচো। আরও দুজনকে পেয়ে যাবে শিগ্রী, দেখো!”

Story published in Rahasya Patrika (May 2016) as a part of Golden Jubilee, 50 years celebration of Masud Rana Series.